ভিন্ন বাঁকের নির্জন শিল্পী : কথাকার জগদীশ গুপ্ত

পরমাশ্রী দাশগুপ্ত

এক

বিষ্ণুই যে রামরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন একথা বাল্মীকির রামায়ণে দেবতারা বার বার উচ্চারণ করেছেন। এই সূত্র ধরে বলা যায় রামের পূর্ব জন্মের কোনো পাপ থাকতে পারে না। অন্যদিকে রাম তার রামজন্মে যে সমস্ত অন্যায় করেছেন, যেমন বালী ও শম্বুককে অন্যায় ভাবে হত্যা, সীতাকে প্রত্যাখ্যান ও পরিত্যাগ— এগুলোকে রামায়ণে কোথাও অন্যায় বা পাপকার্য বলে স্বীকারই করা হয়নি। রাবণের শক্তিশেলের আঘাতে সহোদর লক্ষ্মণকে অচেতন দেখে রাম বিলাপ করে বলেছিলেন তিনি পূর্বজন্মে নিশ্চয় এমন কোনো অন্যায় কাজ করেছেন যার ফল তিনি এখন ভোগ করছেন। কিন্তু কৃতকর্মের প্রতিফল লাভের আয়ত্তে তো রামের এই দুঃখকে বিচার করা চলে না। রামায়ণ অনুযায়ী রাম তো কোনো অন্যায়ই করেননি—না পূর্বজন্মে, না রামজন্মে। তাহলে এই দুঃখের কারণ, রামকে ছেড়ে যদি সীতাকে দেখা যায় তাহলে বলতে হয়, রামায়ণে সীতাকেও বার বার স্বরূপত লক্ষ্মী বলা হয়েছে। সীতা এজন্মেও যে পতিপ্রাণা, কর্তব্যনিষ্ঠ রমণী, তাহলে তার জীবনে যে অপরিসীম দুঃখ নেমে এসেছিল তারই বা কারণ কী?

কোনো এক পূর্ব নির্ধারিত নিয়তির অমোঘ নির্দেশ থেকে পৌরাণিক নরনারীরা এমনকী দেবতারও মুক্তি পাননি এমনটাই দেখাতে চেয়েছিলেন প্রাচীন কবিরা। দেবতাকে তারা দেখেননি কিন্তু দেখেছিলেন মানুষের জীবনকে। বুঝেছিলেন মানুষের জীবনে নিষ্ফলতা, ব্যর্থতার আড়ালে আছে রহস্যময় এক অজানা শক্তি। দেখেছিলেন এই অজানা শক্তির অঙ্গুলি হেলনের পাশে মানুষের নিরুপায় আর্তনাদকে।

একদিকে রবীন্দ্রনাথের গল্প, অন্যদিকে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা—এ দুয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রায় নিসঙ্গ যাত্রা শুরু করেছিলেন জগদীশ গুপ্ত বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয় শতকে। আলোকোজ্জ্বল পৃথিবীর উল্টো পিঠের সঙ্গে পরিচিত করতে চাইলেন তিনি আমাদের। বহু প্রচলিত গল্পগ্রন্থ পঞ্চতন্ত্রের একটা শ্লোকে বলা হয়েছে মানুষ যখন ভ্রূণাবস্থায় থাকে তখনই তাঁর জীবনের পাঁচটি ব্যাপারের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। পরমায়ু, কর্ম, ধন, বিদ্যা ও মৃত্যু। অর্থাৎ মানুষের জীবনের নির্মাণ আর অন্তিমকালের সব কিছুই মানুষের নিজের আয়ত্তের বাইরে এবং তার জন্মের আগেই স্থিরীকৃত। এই বহু প্রচলিত শ্লোকের থেকেই জানা যায় নিয়তির ধারণা ভারতীয় জনসানসে বহু প্রাচীনকাল থেকেই ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। আর এই পূর্ব নির্ধারিত ব্যাপারটাই মানুষের জীবনে সব থেকে ভয়ের কারণ। সব থেকে ট্রাজেডি। মনুষ্য জীবনের এই নৈরাশ্য, বিষাদ সম্বন্ধে রহস্যময়তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন কথাকার ছিলেন জগদীশ গুপ্ত। তাঁর এই তিক্ত জীবনবাদ, নির্মোহ গঠন ভঙ্গিমা তাঁকে জনপ্রিয়তা থেকে দূরে সরিয়ে ছিল। তাঁর এই অতল আঁধার সন্ধানী দৃষ্টি তখনকার সমালোচকরা গ্রহণ করতে না পারলেও অস্বীকার করতে পারেননি।

দুই

বিদ্রোবকে আপাদমস্তক ধারণ করে উঠে আসা কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকেরা গল্প ক্ষেত্রে বিবিধ নতুন উপকরণ প্রবেশ করিয়ে প্রাণপণ আলাদা হতে চাইলেন পূর্ববর্তী লেখকদের থেকে, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের থেকে। 'ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ, কাম, হিংসা সমেত গোটা মানুষের মানে খোঁজা, গল্পের ভৌগোলিক সীমাকে প্রসারিত করা, বিচিত্র জীবিকার বিচিত্র শ্রেণির মানুষকে আবিষ্কার করায় মেতে উঠলেন সে সময়কার কথাকারেরা। তখন সাহিত্যে রিয়ালিজমের উপর একটা ঝোঁক থাকলেও তা রোমান্টিকতা শূন্য ছিল না। মধ্যবিত্ত সুলভ মূল্যবোধ থেকে, রোমান্টিকতার শিহরণ থেকে অনেক চেষ্টা করেও যেন গল্পগুলো নিয়ে পরবর্তীকালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধরনের অভিযোগও করেছিলেন যে, অন্ত্যজ জীবন উঠে এলেও সেই জীবনের আসল বাস্তবতা উপেক্ষিত হয়েছে অনেক লেখকেরই কলমে। মধ্যবিত্তের পরিচিত রোমান্টিকতার জাল কেটে লেখকরা যেন কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারছিল না। বুদ্ধদেব বসু সে সময় যদিও বললেন—

"আমরা মোটের উপর অনেক বেশি rational হয়েছি। অন্ধভক্তির উপর আমাদের আর আস্থা নেই। আমরা বিশ্বাস করতে শিখেছি বিজ্ঞানকে। ভগবান, ভূত ও ভালবাসা—এই তিনটি জিনিসের উপর আমাদের প্রাক্তন বিশ্বাস আমরা হারিয়েছি।" (অতি আধুনিক বাঙলা সাহিত্য, কল্লোল, চৈত্র ১৩৩৪) তবুও বিশ্বাসের গ্রন্থিতে গল্পগুলো যেন নিজের অজান্তেই মাঝে মাঝে জড়িয়ে পড়ত। পরিচিত মূল্যবোধের ভাঙন, পারিবারিক ভাঙন, রাজনৈতিক স্বপ্ন ভঙ্গ, মানসিক বিপর্যয় এসেছিল কিন্তু প্রকাশভঙ্গিগত পেলবতা, লেখকের ব্যক্তিগত আবেগের সংমিশ্রণ, বিস্ময় চেতনাও বহন করে চলত অধিকাংশ আখ্যান।

শরৎচন্দ্রের লেখার টানে আবেগের স্রোতে যখন বাঙালি পাঠক ভাসমান, কল্লোলীয় ভাবালুতা রাস্তা কাঁপাচ্ছে তখন খাঁটি ন্যাচেরালিস্টদের মত লিখতে বসলেন জগদীশ গুপ্ত। নির্মাণ করলেন এক ভিন্ন ঘরানা। তাঁর নির্মোহ ভঙ্গিমা, আবেগহীন কথন ভঙ্গি,

বৈজ্ঞানিকের মত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণী শক্তি তখনকার পাঠকদের কখনো কখনো অস্বস্তিতে ফেলে দিত। মানুষ নিজেদের জীবনের যে নিরুপায়ত্ব, অসহায়তাকে নিজের কাছ থেকেই ক্রমাগত আড়াল করতে চায়, যে পরাজিত চিত্রমালাকে প্রকাশিত ধরা অন্যায় বলে মনে করে মানুষের ভিতরকার সেই অকথ্য অনির্বচনীয় সামগ্রীকে, সেই আর্তনাদকে এতদিনের অচেনা প্যাটার্নে গল্পে উপন্যাসে নিয়ে এলেন তিনি। চরিত্রের প্রতি পক্ষপাত-শূন্য, নির্বিকার, নিরাসক্ত, বিজ্ঞানবুদ্ধি পূর্ণ তাঁর লেখা পাঠকদের আশ্বস্ত করে না, সচেতন করে জীবনের অন্তর্গূঢ় জটিলতা সম্পর্ককে, জাগিয়ে তোলে এক সংশয় আর চরাচর ব্যাপী অবিশ্বাসকে।

তিন

জগদীশ গুপ্তের নামে মৌলিক গল্প প্রকাশিত হয়েছিল 'বিজলী' পত্রিকায় ১৩৩১ সালে। ১৩৩৩ সালের কালিকমলম পত্রিকায় একের পর এক নয়টি গল্প প্রকাশিত হল জগদীশ গুপ্তের। তাঁর গল্প গ্রন্থগুলো হল 'বিনোদিনী' (পৌষ, ১৩৩৪), ' রূপের বাহিরে' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬), 'শ্রীমতী' (১৩৩৭), 'উদয়লেখা' (চৈত্র ১৩৩৯), 'তৃষিত সৃক্কণী' (১৩৪০), 'রতি ও বিরতি' (১৩৪১), 'উপায়ন' (১৩৪২), 'মেঘাবৃত অশনি' (১৩৫৪) 'পাইক শ্রীমিহির প্রামাণিক' (১৩৪১?), 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী (১৩৪২)। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে প্রায় পঞ্চাশ- বাহান্নটা গল্প লেখেন তিনি। লেখেন বেশ কিছু উপন্যাসও।

তাঁর এ সমস্ত লেখায় এসেছিল স্বার্থচালিত মানসিক সম্পর্কের কথা। তিনি দেখিয়েছিলেন মানুষের সক্রিয় যৌন প্রবৃত্তিকে, যা মানুষকে নির্মম করেছে, তার মানবিকতাকে হনন করেছে। প্রেমের স্নিগ্ধ চেতনা তাঁর লেখায় ততটা পরিষ্কার নয়। অন্ধ যৌন চেতনা, শারীরিক ক্ষুধা অনেক বেশি স্পষ্ট। তারুণ্যের উচ্ছ্বাসের দিনে এ যেন প্রাজ্ঞ প্রৌঢ়তার শিক্ষা।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বেদে', 'প্রাচীর ও প্রান্তর', 'বিবাহের চেয়ে বড়ো' প্রভৃতি উপন্যাসে যৌনাচারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চিহ্ন ছিল। বুদ্ধদেব বসুর বিভিন্ন পর্বের বিভিন্ন উপন্যাসে উদ্ভাসিত হয়েছিল যৌনতার অনুষঙ্গ। মনীশ ঘটকের 'কনখল' আর 'পটল ডাঙার পাঁচালী'তেও এসেছিল যৌনতার মুক্তাক্ষর। জীবনানন্দ দাশের উপন্যাসে শোনা গিয়েছিল এ বিষয়ে একটু অন্যরকম স্বর, তাতে যৌন উষ্ণতা নেই, যৌনশীতলতা বিষণ্ণতা নিয়ে অপেক্ষা করে থাকে অন্য দিনের। যদিও সমকালে এই আখ্যানমালা প্রকাশিত হয়নি। জগদীশ গুপ্তের যৌনতার জাগ্রত সূচিমুখ, তীব্র এবং সব থেকে বেশি তিক্ত। পতিতা নারীর উপরের আবরণ ভেদ করে অন্তরের উজ্জ্বল প্রেমিকা সত্তা নিয়ে যখন এল শরৎচন্দ্রের নায়িকা রাজলক্ষ্মী, চন্দ্রমুখীরা তখন বারাঙ্গনা নারীকে রোমান্টিক দৃষ্টিতে না দেখে জগদীশ গুপ্ত প্রকাশিত করলেন তার জীবনের বাস্তবতাকে। দেখালেন তার স্বভাবগত রূপ। 'রমাভাস' গল্পে।। 'চন্দ্র সূর্য যতদিন' গল্পে স্বামী ছোট বউয়ের দিকে বেশি মনোযোগী থাকায় বড় বউয়ের যৌন পিপাসা ক্রমে বাড়তে থাকা এবং শেষে পাগল হয়ে যাওয়া—মানুষের যৌন জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতাকে পাঠকের সামনে আনে। তার ভাষাও তীক্ষ্ণ আবেগশূন্য—

"...ক্ষণপ্রভা হঠাৎ আপাদমস্তক চম্‌কিয়া উঠিলো— এই শয্যায় প্রবেশ করিতে তার গা ঘিন ঘিন করিতেছে...অদূরবর্তী ঐ লোকটা কেবল একটি মাংসপিণ্ড।"

[চন্দ্র সূর্য যতোদিন]

সময়ের স্রোতের একেবারে উল্টো দিকে হেঁটে বিশ শতকের দু-তিনের দশকে জগদীশ গুপ্তের এই পংক্তিমালা নির্মাণ, যার ছিল না কোনো পূর্ব পথ প্রদর্শক বা সমসাময়িক সঙ্গী। নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে ব্যতিক্রমীভাবে বিশ্লেষণের সাক্ষর রাখলেন তিনি।

অদ্ভুত চরিত্র নির্মাণের দক্ষতা, মানুষের মনোলোকের গহনে ঢুকে তাকে আবিষ্কার করার ক্ষমতা ছিল জগদীশ গুপ্তের। 'রতি ও বিরতি' গল্পের লেখক দেখান ভালো মানুষ রামের ছেঁড়া থলে থেকে পড়ে যাওয়া টাকার খোঁজ করতে করতেই তার সারাটা জীবন কেটে গেল। 'অপহৃত আকাশ - কুসুম' গল্পে উল্লাস চৌধুরি তার পাকা চুল দেখেও নিজের যে বয়স হয়েছে তা বিশ্বাস করতে চান না কিন্তু একদিন রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখে তিনি আশা করেছিলেন শরীরে অন্যরকম রোমাঞ্চ জাগবে। কিন্তু তা হলো না। ভদ্রলোক মেনে নিতে বাধ্য হলেন এ বয়স্ক ব্যক্তির লক্ষণ। 'পয়োমুখম্' গল্পে নির্বিকার ভঙ্গিমায় অর্থলোভী শ্বশুরের একের পর এক পুত্রবধূ হত্যার কাহিনিকে গাঁথেন লেখক। নিপাট ভদ্রলোকের অন্তরালে বসবাসকারী পশুর প্রবৃত্তিকে, জান্তব সত্তাকে অনাবৃত করেন জগদীশ গুপ্ত। পরীক্ষাগারে বিজ্ঞানীরা যে নির্মোহ দৃষ্টিতে থাকেন, যতটা সত্যানুসন্ধানী হন জগদীশ গুপ্ত তেমন ভাবেই দেখতে চেয়েছিলেন। পাশ্চাত্যে রিয়ালিজম্ অনেক ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। ন্যাচেরালিস্টদের একটা শাখা জন্ম নিয়েছিল। সম্পূর্ণতা না হলেও জগদীশ গুপ্তের লেখা যেন অনেকটা এই ধারার কাছাকাছি। জোলা বা গোঁচুরদের লেখায় যে বাস্তববাদের তীব্র ঝাঁজ ছিল জগদীশগুপ্তে কখনো তা খুঁজে পাওয়া যায়।

চার

প্রত্যেক মানুষেরই বর্তমান আর ভবিষ্যৎ-এর মাঝখানে এক যবনিকা দুলছে। তাদের জীবনে কি ঘটবে তা তার নিজেরও অজানা। মানুষ তাই কিছু পূর্বাভাসের সন্ধান করে ফেরে। স্বপ্ন দেখা, ভবিষ্যৎবাণী, দৈববাণী—এগুলো হলো অতিলৌকিক পূর্বাভাস।

‘দিবসের শেষে’ গল্পে রাতি নাপিত ও নারাণীর পাঁচ বছরের ছেলে একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বলল— ‘মা আজ আমায় কুমিরে নেবে’। একথা তার পরিবারের কেউ বিশ্বাস করেনি। তাদের বাড়ির কাছেই কামদা নদী। এই নদীর তীর, জল তাদের চিরপরিচিত, মমতাময়ী। কিন্তু সবাইকে চমকে দিয়ে নদী থেকে উঠে আসা কুমির সেদিনই নিয়ে গেল তাকে। কী আকস্মিক অথচ অনিবার্য এই নিয়তি—

‘ পাঁচু হেঁট হইয়া ঘট তুলিয়া লইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় তাহারই একান্ত সন্নিকটে দুটি সুবৃহৎ চক্ষু নিঃশব্দে জলের উপর ভাসিয়া উঠিলো; পর মুহূর্তেই সে স্থানের জল আলোড়িত হইয়া উঠিলো; লেজটা একবার চমক দিয়ে বিদ্যুৎবেগে ঘুরিয়া গেল এবং চক্ষের পলক না পড়িতেই পাঁচু জলে পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেলো।”

জগদীশগুপ্ত দেখাতে চেয়েছেন এই নিয়তির শাসনে পরাজিত মানুষকে। বহু প্রাচীন যুগ থেকেই সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে এই নিয়তির প্রসঙ্গ আর এই সূত্র ধরে এসেছে ভবিষ্যৎবাণী বা স্বপ্ন দেখার মত প্রসঙ্গ। যেমন ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে পাওয়া যায় কংসের মৃত্যুর পূর্বে কংস স্বপ্নে কুকুর, কুমির, শিয়াল, ভস্মস্তূপ, কাঠ, শশ্মান ইত্যাদি অশুভ সংকেতের ইঙ্গিত পেয়েছিল। শেক্সপীয়ারের ম্যাকবেথের ডাইনিদের ভবিষ্যৎবাণী সেও এ প্রসঙ্গো উল্লেখ করা যায়।

তিনি তাঁর গল্পগুলোতে দেখাতে চেয়েছেন ভগবান, ধর্ম, নৈতিকতা সমস্ত মূল্যহীন। শুধু সত্য মানুষের তীব্র অসহায়তা। কল্যাণকর, মঙ্গলময় আঙিনাগুলোকে মুছে দেওয়ার জন্যই যেন তাঁর গল্প আয়োজন।

নির্মাণ শিল্পী হিসাবে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন জগদীশগুপ্ত। প্লট নির্মাণের ক্ষেত্রে কোথাও কোনো শিথিলতাকে প্রশ্রয় দেনি তিনি। দৃঢ়সংবদ্ধ জমাট শিল্পকে তিনি বিশ্বের হাহাকারের সামনে দাঁড় করিয়ে দিতেন নির্বিকার চিত্তে।

পাঁচ

জগদীশ গুপ্ত লেখেন মূলত গ্রাম বা ছোট শহরের কথা। সামাজিক রাজনীতিক পটভূমির থেকে তিনি মানবিকতার অবস্থানকে বেশি গুরুত্ব দেন। বেশ কিছু লেখায় বহির্মুখীতা এবং অন্তর্মুখীতার মধ্যে যথেষ্ট ভারসাম্যও রক্ষা করেছেন তিনি। ভাষায় লঘু তরলতা, কৌতুকরস আমদানি করতে চাননি কিন্তু বৈদগ্ধ্যপূর্ণ এক হাস্যরস বা ব্যঙ্গরস তৈরি করতে চেয়েছিলেন তিনি। চরিত্র নির্মাণ করার অসাধারণ দক্ষতা ছিল তাঁর। রাজবালা উপন্যাসের নায়িকা চরিত্রটা প্রকাশ - অপ্রকাশ্যে, ব্যাখ্যাযোগ্য ও ব্যাখ্যার অতীত বোধ ও যন্ত্রণায় ছিন্নভিন্ন হয়েছে। তার সময় ও সমাজের সঙ্গে যেন সে ঠিক মিশিয়ে নিতে পারছে না নিজের মানসিকতাকে। সুতিনী উপন্যাসেও বাঙালির যৌথ পরিবার জীবনে এক মৃতবৎসা নারীর বিচিত্র মানসিক সমস্যা ও চরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। পুরুষ চরিত্রের থেকেও যেন নারী চরিত্রগুলোকে কথাকার তাঁর লেখায় অনেক সহানুভূতির সঙ্গে এঁকেছেন। নারীর উপর সামাজিক ও পারিবারিক বিচিত্র অত্যাচারকে অনায়াস ভঙ্গিমায় বর্ণনা করে গেছেন যা পাঠকের বিবেককে জ্বালিয়ে তোলে। মনোবিকারকে তিনি আলোচ্য জায়গা দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর অনেক লেখা পড়লেই মনে হতে পারে মনোরোগ যেন এক সামাজিক ব্যাধি। জগদীশ গুপ্ত নির্মিত পথ বেয়েই পরবর্তী বহু লেখকরা বিচিত্র মানুষ এবং তাদের বিচিত্র মানসিক গঠন, সমস্যাকে সাহিত্যে আনতে পেরেছিলেন। জগদীশ গুপ্তের ঘরানাকেই কিছুটা অদল বদল করে এসেছিলেন পরবর্তীকালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষেরা।

এক নতুনের প্রবণতা বা ঝোঁক নিয়ে জগদীশ গুপ্ত বাংলা সাহিত্য লিখতে শুরু করেছিলেন এবং ফরমায়েশি সাহিত্যের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। তাই তাঁর জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালের শিল্পীরা নিজেদের লেখার মধ্যে জগদীশ গুপ্তকে এক অন্যরকম স্বীকৃতি দিয়ে গিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে বিশেষত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুবোধ ঘোষের নাম করা যায়। তাঁদের নিজেদের মধ্যে লেখার অমিল বোধহয় আরো বেশি কিন্তু সাহিত্য ক্ষেত্রের একই বাঁকের পথিক তিনজনই এবং সেই বাঁকের প্রথম পদক্ষেপ জগদীশ গুপ্তেরই।

মানুষের জীবনে প্রসন্নতার উলটোপিটের ভিন্ন বাস্তবতাকে খুঁজতে চেয়েছিলেন জগদীশ গুপ্ত। তাঁর লেখার সূত্র হিসাবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার কয়েকটা লাইন ধরিয়ে দেওয়া যায়—

‘‘পথ দিয়ে আসতে আসতে দেখি নির্মম শিশুর দল
ক'টা ইঁদুর ছানা ধরে
তাদের বলি দিয়ে উল্লাস করছে— কী সরল পৈশাচিকতা সৃষ্টির মূলেই যে নির্বিকার নির্মমতা।...
...জীবনকে কি ঘিরে আছে একটি বিপুল প্রচ্ছন্ন, বিদ্রুপ?

এই প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপ— যা ছিল উপেক্ষিত তাকে সাহিত্য জগতে নিয়ে আসার কিছুটা কৃতিত্ব জগদীশ গুপ্তকে আজ না দিলে যে ইতিহাস তৈরি হবে— তা খণ্ডিত।